

ISBN গ্রন্থে
প্রকাশিত প্রবন্ধ



অনুসন্ধান

আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা

গৌতম সরকার
রমাতোষ সরকার
নির্মল দাস

ANUSANDHAN ADIBASI JIBAN O SANSKRITY

(A Collection of Essays in Bengali & English)

Edited by **Goutam Sarkar, Ramatosh Sarkar & Nirmal Das**

Published by Ashutosh Barman

SANGBEDAN

B.S. Road, Malda - 732101

Price - 200.00

©Author

ISBN-978-81-92804989

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০১৫

প্রকাশক

আশুতোষ বর্মণ

সংবেদন

বি.এস. রোড, মালদা - ৭৩২১০১

চলমান : ৯৪৭৪৩ ২৬৩২৩

গ্রন্থস্থল

সম্পাদক ত্রয়

প্রচ্ছদ

সংবেদন

অক্ষর বিন্যাস

সুমন্ত রায়

মুদ্রণ

গ্রাফিক্স রিপ্রোডাকশন

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বিনিময়

২০০ টাকা

প্রবন্ধ ক্রম

বাংলা বিভাগ

- বঙ্গীয় জনজাতির স্বর্ণযুগ — ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল ১৩
 শিকড়ের সন্ধান-পথগায়েতি ব্যবস্থা : সাঁওতাল জনজাতি—বিপ্লবকুমার বর্মণ ১৯
 শোষিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠী : প্রসঙ্গ অভিজিৎ সেনের ‘রহচণালের হাড়’—রমাতোষ সরকার ২৩
 দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান : আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতির অনবদ্য দলিল — কিন্ধুর মণ্ডল ৩০
 লোকায়ত জীবনের অসম্পূর্ণ-পাঠ — গৌতম সরকার ৩৮
 রাভা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় — অখিল ঘোষ ৪০
 সময়ের পথরেখায় রাজবংশী সম্প্রদায় ও চোরচুম্বী পালা — মনুয়া পাঁজা ৪৬
 ওরাওঁ সংস্কৃতির ভাবসংযোগ রীতি — সম্পদ মণ্ডল ৫০
 মহাখেতাদেবীর ছোটগল্লে প্রতিফলিত সাঁওতাল জনজাতির সংস্কৃতি — গোপেশ রায় ৫৬
 দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল সংস্কৃতি : জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু — আজাদ মণ্ডল ৭০
 উত্তর-পূর্ব ভারতের লুপ্তপ্রায় জনজাতি অসুর জনজাতি : একটি সমীক্ষা — অভিজিৎ বর্মণ ৮১
 মেচ/বোড়ো সম্প্রদায়ের বিবাহপ্রথা — জ্যোতিকণা বর্মণ ৮৮
 দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি — সমিত ঘোষ ৯৩
 ছোঁ সংস্কৃতির পণ্যায়ণ প্রসঙ্গ : মাটি থেকে মানিক্যের অংশেয়া — প্রদীপ ত্রিসং ৯৮
 উত্তরবঙ্গের বোড়ো জনজাতির জীবনশৈলী — মিতা রায় ১০৪
 ওরাওঁ জনসমাজের পুজা-পার্বণ — বিপ্লব বর্মণ ১০৯
 তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন
 — তাপস অধিকারী ১১৫
 বুদ্ধদেব গুহর ‘গামহারডুংরী’ উপন্যাসে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ — নির্মল দাস ১২৬

ইংরাজি বিভাগ

Meena and Some Tribal Issues # Shubhendu Shekhar Naskar 133

**Tribal Women's Contribution to the Theoretical Fields of Ecofeminism:
Remembering Chipko Movement # Tania Dutta 140**

**Tribal Quest for Social Identity : Emergence and Growth of the Satyam
Shibam Sundram Movement Among the Santals of Malda 1905-30 # Ashim
Kumar Sarkar 145**

**“Darkness, existential crisis and a quest for identity alongwith human rights
of the Tribal Community”. # Koushik Goswami 163**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন

তাপস অধিকারী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি সম্পর্কে 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রহে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাস লিখেছেন—'দুই বিবদমান জমিদার বাড়ির কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। নদীর বুকে একটি চরকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান ঘটল। সামন্ততাত্ত্বিক জীবনের কতকগুলি উপাদানের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা এবং জমিদার ও শিল্পপতির দ্বন্দ্বে জমিদারের পরাজয়ের বেদনাবোধ উপন্যাসে স্পষ্ট। তবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তারাশঙ্কর সচেতন।'^১ তারাশঙ্করের বেশিরভাগ উপন্যাসের মতো 'কালিন্দী' উপন্যাসটির পটভূমিও পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল। রাঢ়বঙ্গের যে অঞ্চলটি এই উপন্যাসে গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম হায়হাট। রায়হাট অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী, যার স্থানীয় নাম কালিন্দী। তবে এখানকার লোকেরা কালিন্দীকে 'কালী নদী' নামে ডাকে। এই কালী নদীর বুকে সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে এঁকেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি এখানে প্রাচীনকাল ধরে চলে আসা জমিদার নিয়ন্ত্রিত সামন্ততাত্ত্বিক ব্যবস্থার একটি রূপকে যেমন উপন্যাসটিতে তুলে এনেছেন, সেইসঙ্গে ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক পুঁজি নির্ভর ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার বিরোধকেও এখানে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি উপন্যাসের শেষে নায়ক অহীন্দ্রের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দরিদ্র সাধারণ মানুষের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু রাজনৈতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সমকালীন ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ছবিও এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং উপন্যাসটির অনেক বিরুপ সমালোচনা হয়েছে। তবে যে যাই বলুক, এটা ঠিক যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরটির প্রেক্ষিতে তাকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষজনের বিশেষত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনচর্চার বাস্তবসম্মত বিবরণ তুলে ধরে এই উপন্যাসে একটা আঞ্চলিকতার বাতাবরণ তৈরি করেছেন।

'কালিন্দী' উপন্যাসটির কাহিনি গড়ে উঠেছে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদী যে জায়গাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার দু'পাশে রয়েছে দু'টি গ্রাম—রায়হাট ও চক আফজলপুর।

উপন্যাসটিতে মূলত রায়হাট এবং সদ্য জেগে ওঠা চরটিতে এসে বসতি স্থাপন করা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবনচিত্রের কথাই পরিবেশিত হয়েছে। রায়-বংশ এবং চক্ৰবৰ্তী বংশ—এই দু'টি বংশ হল ঐ অঞ্চলের জমিদার। এর মধ্যে রায়-বংশ বহু প্রাচীনকাল থেকেই সেই অঞ্চলের জমিদার উপন্যাসে তাদের ১০৫ জন শরিকের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি শরিকের কর্তা হলেন ইন্দ্র রায়, যিনি ঐ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা ধূৰন্ধর ও কুটকৌশলী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ হল চক্ৰবৰ্তী-বংশ। এই চক্ৰবৰ্তী-বংশের কর্তা হলেন রামেশ্বর চক্ৰবৰ্তী। ইনি এককালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ হলেও পুরো উপন্যাসে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত। ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বর চক্ৰবৰ্তীর মধ্যে শ্যালক-ভগ্নিপতির সম্পর্ক হলেও রামেশ্বরের বাড়ি থেকে ইন্দ্রের বোনের অস্তর্ধানের পর থেকে সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। রামেশ্বর বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়ায় এই উপন্যাসে নায়েব যোগেশ মজুমদারের সাহায্যে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতিকে দুই নাবালক পুত্র মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রকে নিয়ে চক্ৰবৰ্তী পক্ষের জমিদারী সামলাতে দেখা যায়। এর মধ্যে ছোট ছেলেটি অর্থাৎ অহীন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী। উপন্যাসে উল্লিখিত চরটি চক আফজলপুরের যে অংশে চক্ৰবৰ্তীদের জমিদারি ছিল সেদিকেই জেগে ওঠায় তাতে চক্ৰবৰ্তীদের বেশি দাবি গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও ইন্দ্র রায় চরটির প্রতি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ননী পাল নামে এক ব্যক্তিকে চরের কিছুটা অংশ আইনত দান করেন। জমি পেয়ে ননী পাল চক্ৰবৰ্তীদের অপমান করতে গিয়ে ইন্দ্র রায়ের বোন অর্থাৎ মহীন্দ্রের বিমাতা রাধারানি সম্পর্কে কুকথা বলে, যা শুনে বিমাতার সম্মান বাঁচাতে রামেশ্বরের বড় ছেলে মহীন্দ্র তাকে খুন করে এবং বিচারে তার দ্বীপান্তর হয়। এ ঘটনার পর থেকে ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে চক্ৰবৰ্তীদের সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এতসব ঘটনার মাঝেই কালী নদীর বুকে সদ্য জেগে ওঠা চরটিতে সাঁওতাল প্রজাদের আগমন ঘটে। এদের মোড়ল হল কমল মাঝি। সাঁওতালরা সেখানে এসে চরের জঙ্গল কেটে কিছু চাষোপযোগী জমি তৈরি করে সেখানে নানা ধরনের ফসল, শাক, সবজি চাষাবাদ করে, চরের উপর নিজেদের বসত বাড়ি বানায়। একদিন অহীন্দ্র চর দেখতে গেলে এই সাঁওতালরা তাঁকে তাদের ‘রাঙ্গাঠাকুর’ মনে করে সম্মান দেয় এব সেই চর বিলিব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করে। সাঁওতালদের এই রাঙ্গাঠাকুর অর্থাৎ সোমেশ্বর চক্ৰবৰ্তী হলেন আসলে অহীন্দ্রের ঠাকুরদা, যিনি একসময় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের সাঁওতালদের হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যাইহোক অহীন্দ্র নিজেদের জন্য চরের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অংশটি রেখে বাঁকিটা সাঁওতালদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করে দেয়, অবশ্য এই বিলি ব্যবস্থায় রংলাল, নবীনের মতো তাদের জমিদারিতে বসবাসকারী মানুষগুলিও কিছু জমি পায়। এরপর সাঁওতালরা কালিন্দী তথা কালী নদীর বুকে জেগে ওঠা ঐ চরটির নতুন নামকরণ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঘঁগলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন করে 'রাঙ্গাঠাকুরের চর'।

এদিকে তাঁরই বোনের সম্মান রক্ষার্থে রামেশ্বরের ছেলে মহীন্দ্র মানুষ খুন করে সাজা পেয়ে দ্বিপাত্রে গেলে ইন্দ্র রায় হয়ত অনুশোচনায় পড়ে চক্ৰবৰ্তীদের প্রতি সমস্ত বৈরিতা ছেড়ে সদ্য জেগে ওঠা 'রাঙ্গাঠাকুরের চর'-টির উপর নিজের দাবি ত্যাগ করেন এবং রামেশ্বরের পরিবার যাতে চৱটি ভোগ করতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হন। এর পেছনে ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী হেমাঞ্জিনীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাদের এই সচেষ্টতা মহীন্দ্রের বিচারের সময় থেকেই শুরু হয়। ফলে দীর্ঘদিন পর দুঁটি পরিবার কাছাকাছি আসে। এদিকে মহীন্দ্রের মামলার খরচ জোগাতে গিয়ে চক্ৰবৰ্তীদের নায়েব যোগেশ মজুমদার কারণে-অকারণে প্রচুর ঝণ করেন, যা পরিশোধ করতে গিয়ে রামেশ্বরের সম্পত্তির সিংহভাগ বিক্রি করতে হয়। এই সম্পত্তি নায়েব যোগেশ মজুমদার বেনামে কিনে ফেলে। ঝণশোধ করার তাগিদে আর্থিক টান পড়ায় কালী নদীর উপর জেগে ওঠা 'রাঙ্গাঠাকুরের চর'টির উপর চক্ৰবৰ্তীদের হাত দিতে হয়। অহীন্দ্র বিমল মুখার্জি নামক কলকাতার এক ধনি ব্যবসায়িকে চৱটির কিছু অংশ বিলি ব্যবস্থা করে দেয়। বিমলবাবু সেখানে চিনি কারখানা গড়ার তোড়জোড় শুরু করেন। ফলে এই চৱটিকে কেন্দ্র করে নানা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। বিমলবাবু ছলে-বলে-কৌশলে সাঁওতালদের বিলি ব্যবস্থা করা জমিগুলিরও দখল নেয়। এতে সাঁওতালরা কৃষিজীবী থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হতে থাকেন এবং একসময় সেই চৱ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদিকে সেই চৱের স্বত্বকে কেন্দ্র করে জমিদারের সঙ্গে শিল্পপতির আইনি লড়াই শুরু হয়। একদিকে ছিলেন চক্ৰবৰ্তীদের পক্ষে সামন্ততাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূত জমিদার ইন্দ্ররায়, আর অপরক্ষে ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি পুঁজিপতি বিমলবাবু। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মামলার রায়ে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র রায়ের পরাজয় ঘটে। বিমলবাবু জোরকদমে চিনি কারখানার কাজ শুরু করে দেয়। ফলে সে অঞ্চলে রাস্তাঘাট, যানবাহন থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতার অনেক উপকরণের প্রবেশ ঘটাতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ঢোকে আধুনিক সভ্যতার ব্যাভিচারগুলিও। এদিকে মামলায় হেরে ইন্দ্র রায় সবকিছু ছেড়ে তার জমিদারি সত্ত্বা ত্যাগ করে কাশীবাসী হবার মনস্ত করে। ইন্দ্র রায়ের রায়হাট ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অঞ্চলটি থেকে সামন্ততত্ত্ব একরকম অবসানের পথে এগিয়ে যায়।

এই উপন্যাসের আঘঁগলিক প্রেক্ষাপটে একদিকে সামন্ততত্ত্বের সঙ্গে ধনতত্ত্বের বিরোধের প্রসঙ্গ থাকলেও অন্যদিকে অহীন্দ্রের কার্যকলাপের মধ্যে সে সময়কার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গও আছে। মহীন্দ্রের দ্বিপাত্র হওয়ার পর ইন্দ্র রায় চক্ৰবৰ্তীদের কাছাকাছি আসলে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা আত্মায়তায় পর্যবশিত হয়—ইন্দ্র রায় রামেশ্বরের ছোট মেধাবী তথা উজ্জ্বল ছেলে হিসেবে পরিগণিত হলেও বিয়ের কিছুদিন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন

আগে থেকেই অহীন্দ্রের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। হয়ত সেই অঞ্চল ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করার কারণেই জগতের বিচি সব পরিবর্তন তার চোখে ধরা দিতে থাকে। পাশাপাশি তাদের সেই অঞ্চলে বিমলাবাবুর কার্যকলাপ, সাঁওতালদের জীবনধারার বিপর্যয় থেকে শুরু করে গরিব অসহায় মানুষগুলির দুরবস্থা তাকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবাতে শুরু করে। এজন্য সে এক নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। তাই ইন্দ্র রায়ের মেয়ে উমা বিয়ের আগে পর্যন্ত অহীন্দ্রকে যেভাবে পেতে চেয়েছিল, বিয়ের পর আর তাকে সেভাবে পায় না। অহীন্দ্র সান্নাজ্যবাদী বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করে। উপন্যাসের শেষে সে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে। অহীন্দ্রের এই গ্রেপ্তারিয়ে সংবাদ শোনার পর তার বাবা রামেশ্বর চক্রবর্তীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঠিক হয়ে যায়। তার মুখ থেকেই জানা যায় যে, তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ ইন্দ্র রায়ের বোন রাধারানিকে আর তার সন্তানকে সে গলা টিপে মেরে বাড়ির কুয়োর মধ্যে পুঁতে দিয়েছিল। তার বিশ্বাস এতে রাধারানির অভিশাপে যে পাপ তার লেগেছিল, দুইপুত্র—মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রের কারাবরণে সেটা কেটে গেছে। উপন্যাসের শেষে কালিন্দীর রূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। কালিন্দীর বুকে আগে যেখানে আকাশ, নদীতীরের গাছ-গাছালির ও পাখিদের ছবি ভাসত; আর আজ সেখানে ঐগুলির সঙ্গে উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশির ছবি ভাসে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে খানিকটা বিরুদ্ধ মন্তব্য করতে বলেছেন—‘পরবর্তী উপন্যাস ‘কালিন্দী’ (১৯৪০) অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের’^২ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উপন্যাসটির হয়তো কিছু দোষ-ক্রটি আছে, তবে উপন্যাসটিকে একেবারে ‘নিম্নস্তরের’ বলাটা মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি। যাইহোক ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটির বেশ কিছু গুণ আছে, যেগুলি পাঠককে মুগ্ধ করবে। এই গুণগুলির মধ্যে অন্যতম হল উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের জীবনচর্চার প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পটভূমির ব্যবহার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের মত ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটি ও রাঢ়বঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচনা করেছেন। রাঢ়বঙ্গের ব্রাহ্মণী নদীর দুই তীরে রায়হাট এবং চক আফজলপুর নামক দুটি গ্রামের কথা এই উপন্যাসে আছে। অবশ্য এখানে রায়হাটের জীবনকথাই বর্ণিত হয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণী নদী কালিন্দী নামে পরিচিত। তবে স্থানীয় মানুষজন কালিন্দীকে কালী নদী বলেই ডাকে। এই কালী নদীর চক আফজলপুর সীমান্তে একটি চর জেগে ওঠে। উপন্যাসে চরটির বর্ণনায় বলা হয়েছে—‘গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলশ্বেত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলিমাটিতে

মিশানো তৃণহীন স্থান, তারপরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে—অসংখ্য কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর নানা ধরনের বিষধর সাপ।^{১০} উপন্যাসে বর্ণিত চরটির ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং তাকে কেন্দ্র করে মানুষজনের বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজনের নানা ত্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে। এই চরটি রায়হাটের জমিদারদের মধ্যে একপক্ষ চক্ৰবৰ্তীদের সীমানায় ওঠে। চরটির প্রতি রংলাল পাল, নবীন বাগ্দীর মতো চক্ৰবৰ্তীদের পুরাতন প্রজারা লোভ ও দাবি করে। আবার জেগে ওঠা চরটির খবর পেয়ে সাঁওতালরা সেখানে এসে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাসের উপযোগী করে তোলে। চক্ৰবৰ্তীদের পক্ষে রামেশ্বর চক্ৰবৰ্তীর ছোট ছেলে অহীন্দ্র নিজেদের চাষবাদের জন্য কিছু অংশ রেখে বাকিটা সাঁওতালদের ও নিজের প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেয়। সাঁওতাল প্রজারা অহীন্দ্রের পিতামহ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সোমেশ্বর চক্ৰবৰ্তীর নামে এই চরটির নাম দেয় ‘রাঙাঠাকুরের চর’। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেউই জমির উপর নিজেদের সত্ত্বা ধরে রাখতে পারে না—কলকাতার ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জি সেখানে চিনির কল বসায়। ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটির অল্প কিছু ঘটনা কলকাতা এবং অন্যত্র ঘটলেও বেশিরভাগ ঘটনা এই ‘রাঙাঠাকুরের চর’, রায়হাট গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘটেছে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রকৃতি ও মানুষজন বিশেষ করে সাঁওতালদের জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

‘কালিন্দী’ উপন্যাসটিতে দুই জমিদার বংশ—রায়-বংশের ইন্দ্র রায়, হেমান্দিনী, অমল, উমা ও অন্যান্য শরিকের কিছু লোকজন এবং চক্ৰবৰ্তী-বংশের রামেশ্বর, সুনীতি, মহীন্দ্র, অহীন্দ্র প্রমুখদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দুই বংশের মানুষজন অচিন্ত্যবাবু, দোকানদার শ্রীবাস পাল ও তার ছেলে গণেশ প্রমুখদের মতো সুবিধাবাদী ভদ্রশ্রেণির মানুষ, তেমনি আছে রংলাল ননী পালের মতো চাষিরা। এদের পাশাপাশি আছে দুই উপজাতি সম্প্রদায় বাগ্দী ও সাঁওতালরা। ঔপন্যাসিক বাগ্দীদের জীবন কথা দু-একটি অঁচড়ে শেষ করেছেন। এরা লেঠেল, জমিদারের হয়ে লাঠিয়াল বৃত্তি এদের জীবিকা। তাই জমিদারের প্রয়োজন হলে এরা যখন তখন লাঠি হাতে বেড়িয়ে আসে। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনকথাই মূখ্য। তারাশঙ্করের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ‘কালিন্দী’র বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাঁওতালদের সম্পর্কে বলেছেন— ‘বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি বাংলার আর পাঁচটা জেলার মতো কৃষি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সাধারণ ভাগচাষিকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে—যেটা ও এ অঞ্চলেরই নিজস্ব ব্যাপার। অল্প মজুরিতে কঠিন শ্রমের সাহায্যে এরা বীরভূমের কাঁকুরে বিমুখতাকে ব্যর্থ করে দেয়। একদিকে ধৰ্মসমূহী সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে সাঁওতাল কৃষকদের ঘর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন

তুলতে গিয়ে যায়াবরত্ত ত্যাগের বাসনায় ইতিহাসের একটা পর্যায় স্পষ্ট (কালিন্দী)^৪ এই উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবন ও জীবিকার অনেকটাই বিস্তারিত ছবি আছে। উপন্যাসে বিমলবাবু এবং অচিন্ত্যবাবু বাইরের লোক। বাকিরা প্রায় সবাই ঐ অঞ্চলের লোকজন। এই উপন্যাসে দুই জমিদার বৎশের উচ্চবর্ণের মানুষগুলিসহ অন্যান্য সুবিধাভোগী লোকজন এবং বাগ্দী ও সাঁওতালরা সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবিভৃত হয়েছে। এদের মধ্যে সাঁওতালদের জীবন চিত্রণই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

এই উপন্যাসটিতে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ভদ্র-অভদ্র নানা ধরনের চরিত্রের পরিচয় থাকলেও একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ‘কালিন্দী’র প্রধান চরিত্র কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা চর্টি, সাঁওতালরা যার নাম দেয় ‘রাঙ্গাবাবুর চর’, যা শুনে অহীন্দ্র নাম দেয় ‘রাঙ্গাঠাকুরের চর’। সমালোচকেরা ইন্দ্র রায় এবং অহীন্দ্রের মধ্যে কাকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায়, তা নিয়ে চুলচেড়া বিশ্লেষণ করলেও সকলের অজান্তে কখন এই চরটি নায়কত্বের দাবি নিয়ে হাজির হয় তা বোঝা যায় না। অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে চরটির গুরুত্ব বোঝাতে চেয়ে লিখেছেন—‘বস্তুত এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুইটি—এক, মানুষ রামেশ্বর ও দ্বিতীয় জড়প্রকৃতি কালিন্দীর চর।’⁵ ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে ওই চরটির বিবরণ দিয়ে—

‘নদী ও-পারে একটা চর দেখা দিয়াছে।’

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী—ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ও-পারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি। এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙ্গন ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।

ওই চরটি লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল।...⁶

আর উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এর অন্যতম চরিত্র রামেশ্বরের দৃষ্টিতে চরটির বর্ণনায়—‘ওই দুরে—নতুন ওঠা সর্বনাশ চরটার কোল দেঁয়িয়া শীর্ণ কালিন্দীর বারোমাসে অগভীর অপরিসর জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। মন্ত্র তাহার গতি এখন। কালের ভগী কালিন্দী! কালিন্দীর জলস্তোত্রের মধ্যে নৃতন চরটার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। ... আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছ-গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত—আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্ত্রোতধারার উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনিদেশ্য শাসনের মতো ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল।’⁷ এই দুই-এর মাঝে উপন্যাসের বিবাদ-বিসম্বাদ, লড়াই-সংঘর্ষ, মামলা-মোকদ্দমা থেকে শুরু প্রায় সমস্ত ঘটনা সংঘটনের

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন

পেছনে এই চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন পর রামেশ্বর চক্ৰবৰ্তীৰ পরিবার এবং ইন্দ্ৰ রায়ের পরিবারের মধ্য সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক তৈরিৱ পিছনেও এই চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চিনিৰ কল স্থাপনেৰ মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলেৰ অৰ্থনৈতিক পৱিতৰণেৰ যে কাজকৰ্ম শুৰু হয়েছে তাৰ পেছনেও আছে এই চরটি। উপন্যাসিক তারাশঙ্কৰ এই উপন্যাসে প্ৰাচীন কালেৰ সঙ্গে নবীন কালেৰ বিৱোধকে এই চৱেৱ প্ৰেক্ষাপটেই উপস্থাপন কৱেছেন। এইজন্য সমগ্ৰ উপন্যাসটিতে চৱটিৰ অনিবার্য প্ৰভাৱেৰ দিকে নজৱ দিয়ে অধ্যাপক বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন—‘অবশ্য গ্ৰামেৰ চাষী প্ৰজাৰ মধ্যে ইহা, একটা লোলুপতাৰ তুফান বহাইয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে শ্বাপদ-সুলভ হিংস্র দীপ্তি ও জ্বালাইয়াছে কাহাকেও কাহাকেও প্রলুক্ত কৱিয়া সৰ্বনাশেৰ রসাতলে পাঠাইয়াছে। যায়াৰ সাঁওতাল-সম্প্ৰদায় অল্পদিনেৰ জন্য ইহাৰ আতিথেয় বক্ষে নীড় রচনা কৱিয়া আবাৰ ইহাৰ মেহ শীতল, অথচ পিছিল অক্ষ হইতে দূৰে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—চৱ ইহাদিগকে মাতাৱ ন্যায় আহান কৱিয়া বিমাতাৰ ন্যায় বিসৰ্জন দিয়াছে। কলওয়ালা মিঃ মুখার্জিৰ লৌহ-শাসনে ইহা নিজ বন্য প্ৰকৃতি হারাইয়া যান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ কৱলে আত্মসমৰ্পণ কৱায়িছে এবং যত্নোচিত নিৰ্মতাৰ সহিত পূৰ্বতন প্ৰভুৰ সৰ্বনাশ সাধনেৰ অন্তৰূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতৱাং উপন্যাস মধ্যে কালিন্দীৰ চৱ যে একটি সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৱিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।’^{১৮} সুতৱাং দেখা যাচ্ছে ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে কালিন্দীৰ বুকে জেগে ওঠা চৱটিই কাহিনিতে নিয়ন্ত্ৰকেৰ ভূমিকা নিয়েছে। এই ‘ৱাঙাঠাকুৱেৰ চৱ’টিৰ সঙ্গে একাত্ম কৱে এই উপন্যাসে সাঁওতালদেৱ জীবনচিৰি পৱিবেশিত হয়েছে।

এসবেৱ পাশাপাশি ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটিতে তারাশঙ্কৰেৰ সেই অঞ্চলেৰ মানুষদেৱ বিশেষ কৱে সাঁওতাল সম্প্ৰদায়েৰ মানুষদেৱ জীবন-জীবিকাৰও বিস্তাৱিত পৱিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটিতে প্ৰথমদিকে জমিদাৰ নিয়ন্ত্ৰিত কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাৰ বিস্তাৱিত পৱিচয় আছে। অবশ্য পৱিবৰ্তীতে বিমলবাবুৰ প্ৰবেশেৰ পৱ চিনিৰ কল স্থাপন প্ৰক্ৰিয়াৰ মধ্য দিয়ে কৃষি সভ্যতা ছেড়ে উপন্যাসটিতে শিল্পসভ্যতাৰ পৱিচয় তুলে ধৰাৰ চেষ্টা কৱা হয়েছে। সে সময় কৃষকেৱা শ্ৰমিকেৱ রূপান্তৰিত হয়েছে। সে অঞ্চলেৰ কৃষক সম্প্ৰদায়েৰ জীবনে কালিন্দী অৰ্থাৎ কালী নদী অত্যন্ত গুৱুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৱে। তাই কৃষিজীবী রংলালেৰ মুখে শোনা যায়—‘কালী তো আমাদেৱ সাধাৱণ নদী লয় দাদাৰাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমেৰ ভগী।’^{১৯} উপন্যাসে এই কালী নদীৰ বুকে জেগে ওঠা ‘ৱাঙাঠাকুৱেৰ চৱ’টিকে কেন্দ্ৰ কৱেই ঐ অঞ্চলেৰ মানুষগুলিৰ জীবিকাৰ বৰ্ণনা দেওয়া আছে। সাঁওতালৱাই প্ৰথম এই চৱটিকে চাষবাসেৱ উপযোগী কৱে তোলে। সেখানে তাৱা ধান, গম, ভুট্টা, আখসহ নানা মৱশুমি সবজি চাষাবাদ কৱে। রংলালেৰ দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক এৱ বৰ্ণনায় লিখেছেন— ইহাৱই মধ্যে প্ৰায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভৱিয়া উঠিয়াছে। চৰিৱা খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহাৱা

ভূট্টা, সন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; জমির ধারে সারিবন্দী চারা, তাহাতে শিম, বরবটি, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়িঘরের চালে নৃতন খড় চাপানো হইয়া গিয়াছে, কাঁচা সোনার রঙের নৃতন খড়ের বিছানি অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে।’^{১০} এই সাঁওতালরা বর্ষার সময় মহাজনের কাছে খোরাকি ধান নেয়, তারপর মনের আনন্দে চাষ চাষে এবং ফসল উঠলে সুদসহ ধার শোধ দেয়। এরা নিজেদের কাজের ফাঁকে জমিদারের জমিতেও চাষাবাদের কাজে বেগার খাটে। অবশ্য বিমলবাবুর খপ্পরে পরে এদের আর কৃষক থাকা হয় না, কেউ কেউ কলের শ্রমিক হয়ে যায়, বাকিরা সে অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে বাসগৃহ, খাদ্যাভাস, খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু কিছু বিবরণ আছে। এরা খড়ের চালার ছোট ছেট ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে। প্রত্যেকের বাড়িতে এক টুকরো উঠোন আছে। তবে সবকিছুই সাঁওতাল রমণীদের লেপা-মোছা ও নানা কর্মকুশলতার কারণে নিকানো-গুচানো ও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে এরা নিজেদের চাষকরা খাদ্যশস্য ও শাক-সবজিকেই প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়াও মুরগি পোষার কারণে মুরগির মাংসের পাশাপাশি চরটির বনাঞ্চল থেকে ধরা ইঁদুর, খরগোসের মাংসও তারা রান্না করে অথবা পুড়িয়ে খায়। আর উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় তো বটেই অন্যান্য সময়েও দেশি মদ হাঁড়িয়া বা পচানিকে এরা পানীয়ের মধ্যে প্রথমে রাখে। অবশ্য বিমলবাবুর সৌজন্যে বিদেশি মদের সঙ্গেও এদের পরিচয় হয়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিস্তারিত বিবরণ তেমন না থাকলেও উপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, সাঁওতাল মেয়েরা সাগ-গোজ করতে অত্যন্ত ভালোবাসে। সাজ-গোজের অলংকার হিসেবে তারা স্থানীয় নানা ধরনের রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল ব্যবহার করে।

‘কালিন্দী’ উপন্যাসে উচ্চবর্ণের পাশাপাশি সাঁওতালদের স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকরঞ্চি, লোককথা প্রভৃতির বিবরণও আছে। উচ্চবর্ণের লোকজনদের ক্ষেত্রে এখানে হিন্দু-সংস্কৃতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অহীন্দ্র-উমার বিয়ে সংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতায় উচ্চবর্ণের হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয় তারাশক্তির দিয়েছেন। তবে সাঁওতালদের জীবনচর্যার বর্ণনায় তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন তাদের মোড়ল কমল মাঝির মুখ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত তাদের বিশ্বাস তথা পুরকথাকে শুনিয়েছেন, তেমনি দু-একটি অনুষ্ঠান-পর্বের বিবরণও দিয়েছেন। অহীন্দ্রের পড়াশুনার কথা শুনে তার জাত ভাইদের সামনে একবার কমল মাঝি তার কাছে জানতে চায়—‘হাঁ বাবু, এই যি পৃথিমীটি, এই যি ধরতিমায়ী—ইকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তুদের?’^{১১} তার এই প্রশ্নের উত্তরে অহীন্দ্র পৃথিবী

সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলে কমল মাঝি তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে—‘উহ, তুকে এখনও অনেক পড়তে হবে। পিথিবীতে আগে ছিল জল। কিছুই ছিল না, শুধুই ছিল জল। তারপরে হ'ল কি জানিস? বলি শোন’।^{১২} এসব বলে পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত একটা ভাস্ত আজগুবি গল্পের অবতাড়না করে। তবে মাঝির বাচন ভঙ্গিতে এই গল্পটিতে তার তো বটেই সেখানকার সমস্ত সাঁওতালদের আন্তরিক বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই গল্পটিকে ঐ অঞ্চলের সাঁওতালদের পুরাণ কথা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে ‘বাতুলী’ পরবের উল্লেখ আছে। এর ব্যাখ্যায় তাদের মোড়ল কমল মাঝি বলেছে—‘নাম বটে ‘বাতুলী’ পরব। আবার ‘কদ্লেতা’ পরবও বুলছে। ‘রোওয়া’ পরবও বলে। ‘বাইন’ পরবও বুলছে। যারা যেমন মনে করে, তুলে।’^{১৩} শুধু তাই নয়, এই পরব কোথায় কীভাবে পালিত হবে তার বিবরণও এই উপন্যাসে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—‘জাহন সারনে’—আমাদের দেবতার থানে গো পূজো হবে। এডিয়াসিম’—আমাদের মোরগকে বলে ‘এডিয়াসিম’, ওই মোরগা কাটা হবে, পাচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তারপরে রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতাথানে, লিয়ে খেঁয়েদেয়ে সব নাচগান করব।’^{১৪} সাঁওতালরা যে আদতে একটি ফুর্তিবাজ গোষ্ঠী তার পরিচয়ও উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এজন্য দেখা যায় কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সময় সুযোগ পেলেই আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে, পাচুই মদ খায়, নাচ-গান করে—পুরুষরা মাদল বাজায় আর মেয়েরা নানা সুরে বিভিন্ন ধরনের গান গায়। যেমন উপন্যাসের একটি অংশে অহীন্দ্র সাঁওতালদের জমির বন্দোবস্ত করে দিলে তারা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। উপন্যাসিক লিখেছেন—‘নদীর ধারে আসিয়া মাদলের শব্দে ও সাঁওতাল মেয়েদের গানের সুরে তাহার চিন্তার একটানা ধারাটা ভাঙ্গিয়া গেল। ও-পারের চরে আজ প্রবল সমারোহে উৎস হইয়াছে, আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগি, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহার পর আকঠ পাচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অঙ্গুত জাত।’^{১৫} ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের এই সমস্ত পরিচয়ের দিকে নজর দিয়েই অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—‘সাঁওতালগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সমাজবন্ধনের বর্ণনায় অভিনবত্বের চিত্রসৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাহাদের উন্নত কল্পনা, সরল আমোদ-প্রমোদ ও বিচিত্র সমাজব্যবস্থা লেখকের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেয়।’^{১৬}

‘কালিন্দী’ উপন্যাসটি তারাশঙ্কর সাধুভাষায় রচনা করেছেন। উপন্যাসে ভদ্র চরিত্রের মার্জিত রাঢ়ী ভাষায় অর্থাৎ মান্য চলিত ভাষায় কথা বলেছে। তবে নিম্নতর চরিত্রের সংলাপ রচনায় তারাশঙ্কর রাঢ়ী উপভাষার স্থানীয় আঞ্চলিক রূপকেই গ্রহণ করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন

রংলাল পাল, ননী সাহা, নবীন বাগদীর মতো স্থানীয় নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবৃত্তির মানুষেরা এই ভাষায় কথা বলেছে। যেমন রংলাল বলেছে—‘এই তো ক বছর হল গো বাবু মশায়, একটা বাচুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। বাস, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি—ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাচুরটার চেঁচানি! বাস, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে। দেখতে দেখতে বাচুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মতো লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হল না যে এগিয়ে যাই।’^{১৭} সাঁওতাল মানুষগুলির মুখের ভাষায় তারাশঙ্কর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একদিকে যেমন তিনি তাদের ভাষার কিছু গান এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন, তেমনি কথোপকথনে তাদের ভাষার নানা শব্দ ও ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসে উল্লিখিত সাঁওতালি গানের দৃষ্টান্ত হল—

‘অথ জনম্ ধরতি লেন্ডং

অথ জনম্ কু মানোয়া হড়

মান মান কু মানোয়া হড়

ধরতি কু ডাবাও অ-কাদা,

ধরতি সানাম্ কু ডাবাও কিদা।’^{১৮}

আর সাঁওতালি ভাষার দৃষ্টান্ত হল—ই-রে-কম্বড়ো সে-তা হড়িচ-হড়িচ! অর্থাৎ ওরে চোর কুকুর, পালা বলছি, পালা বলছি, পালা।’^{১৯} অবশ্য বাংলা সংলাপের ক্ষেত্রে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষগুলিও স্থানীয় আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলেছে। এই ভাষায় তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভাষার ছাপ স্পষ্ট পড়েছে। যেমন কমল মাঝি বলেছে—‘হঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ! হঁ, ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।’^{২০} এই রকমই চূড়া মাঝি বলেছে—‘টাকা লইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই। খেপে কি করব? আর বাবু খেপে মরেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বাবু, টাকা নাই। খেপে কি করব? আর বাবু খেপে মরেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বল? বুদ্ধি করলম ইবার আমরা।’^{২১} যুবতি মেয়ে সারী বলেছে—‘কেনে ঝগরা করবে না কেনে? চ'লে যাবে না কেনে? তু বাবু, বিচার ক'রে দে! বুড়া-বুড়ীর করণ দেখ।’^{২২} এই ভাবে সাঁওতালদের আঞ্চলিক কথ্যরীতির ভাষারীতিকেও তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন।

এইভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে রাঢ়বঙ্গের বিশিষ্ট উপজাতি সম্প্রদায় সাঁওতালদের জীবনের বিস্তারিত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই উপন্যাসে মূলতঃ রাঢ়বঙ্গের ব্রাহ্মণী অর্থাৎ স্থানীয় কালিন্দী বা ‘কালী নদী’ সংলগ্ন রায়হাট অঞ্চলের জীবনকথা পরিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কালিন্দীর উপর জেগে ওঠা ‘রাঙাঠাকুরের চর’কে কেন্দ্র করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবন-জীবীকার খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন লোকাচার, লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কৃতি, পুরাণকথা, ভাষারও নানারূপ ধরা পড়েছে। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটি রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষিতে সাঁওতালদের জীবনকথার নামান্তর হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

- ১। সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী : সম্পাদন শিশিরকুমার দাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫০।
- ২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৪-২০০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৫২।
- ৩। কালিন্দী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্দশ মুদ্রণ, পৌষ ১৪১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭।
- ৪। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৩, কার্তিক ১৪১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৪৩।
- ৫। বঙ্গ সাহিত্য উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা-৫৫২।
- ৬। কালিন্দী, পৃষ্ঠা-৩
- ৭। তদেব পৃষ্ঠা-২৩৫
- ৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা-৫৫৩।
- ৯। কালিন্দী, পৃষ্ঠা-১৮
- ১০। তদেব পৃষ্ঠা-৮৮
- ১১। তদেব পৃষ্ঠা-৬৯
- ১২। তদেব পৃষ্ঠা-৬৯
- ১৩। তদেব পৃষ্ঠা-১২৫
- ১৪। তদেব পৃষ্ঠা-১২৫
- ১৫। তদেব পৃষ্ঠা-৮২
- ১৬। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা-৫৫৩।
- ১৭। কালিন্দী, পৃষ্ঠা-১৭
- ১৮। তদেব পৃষ্ঠা-৬৯
- ১৯। তদেব পৃষ্ঠা-১৮৪
- ২০। তদেব পৃষ্ঠা-২১
- ২১। তদেব পৃষ্ঠা-৭২
- ২২। তদেব পৃষ্ঠা-৮৩